তুলি-কলম

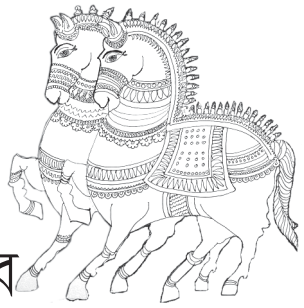

বিশ শতকের বাঙালির মহাভারত চর্চা : বুদ্ধদেব বসু

স্নেহাশিস দাস কর্মকার

বিশ শতকে যে-সমস্ত সমালোচক এবং প্রাবন্ধিক বাঙালির মহাভারত চর্চা নিয়ে ভেবেছেন, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু অন্যতম। তাঁর 'মহাভারতের কথা' নামে বিখ্যাত প্রবন্ধের বইটি রচিত হয়েছিল ১৯৭১-৭২-এর হেমন্ত ও শীত ঋতুতে। দেশ পত্রিকায় আঠারোটি কিস্তিতে সেটি প্রকাশিত হয়। সামান্য সংশোধনের পর ১৯৭৪ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি যথার্থভাবে মহাভারতের নানা দিক নতুন করে ভাবতে সাহায্য করে। শুধুমাত্র মহাভারত চর্চার নতুন এক দিগন্ত মাত্র নয়, বইটির খ্যাতির অন্যতম প্রধান কারণ হল এখানে উল্লিখিত ১৬২টি টীকা। বইটির সঙ্গে টীকাগুলিকে মিলিয়ে পাঠ করলে তবেই গ্রন্থটির আলোচনার পরিধি এবং বক্তব্য বিষয় পরিপূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব। বলা বাহুল্য, গ্রন্থটিতে বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত চর্চা তুঙ্গ স্পর্শ করেছে।

অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের সামনে দাঁড়ানো এক কিশোর রাজকুমারকে আমরা দেখেছি, মহাভারতের বিশাল পটভূমির তীরে এই ঘটনার হয়তো তেমন গুরুত্ব নেই। পাঠক কিছুটা কৌতুকের সঙ্গেই যুধিষ্ঠিরের অসাফল্যকে দেখেন। অস্ত্রপরীক্ষায় সেরার শিরোপা তাঁর মুকুটে কোনওদিন একটি অতিরিক্ত পালক হিসেবে স্থান পায়নি। বিশ শতকে যে-সমস্ত প্রাবন্ধিক মহাভারত নিয়ে প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন, তাঁদের অনেকেই যুধিষ্ঠিরকে দুর্বল একটি চরিত্র হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'মহাভারতের কথা'-য় অস্ত্রপরীক্ষায় পরাজিত এক রাজকুমারকে জীবনের পরীক্ষায় নিয়ে গেছেন অন্য এক উচ্চতায়, তাঁকে করে তুলেছেন আমাদের অন্যতম প্রিয় নায়ক যুধিষ্ঠির। তাঁর আগে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে এত মূল্যবান এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য কেউ উপস্থাপন করেছেন বলে জানা নেই। মহাভারতের কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেববাবু তুলে এনেছেন দেশবিদেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্য, উপন্যাসের নানা প্রসঙ্গ।

আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি পাশাখেলার নেশাকে ঘিরে সম্রাট যুধিষ্ঠিরের অপরিণামদর্শিতা, যুদ্ধক্ষেত্রে অসত্যভাষণ। পাশাখেলায় মত্ত এবং প্রায় সম্পূর্ণ বাহ্যিক বোধশূন্য সম্রাট নিজ ভাইদের ও দ্রৌপদীর জীবনে নামিয়ে এনেছিলেন ঘোর অনিশ্চয়তার ছায়া। নিশ্চেষ্ট মূঢ়তায় দ্রৌপদীর জীবনে অকল্পনীয় লাঞ্ছনার ভবিতব্য ডেকে আনার জন্য আমরা যুধিষ্ঠিরকে ক্ষমা করতে পারিনি। যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে ভাবতে গেলে যখন আমাদের

মনে এই বিষয়গুলি ছায়া ফেলে, তখন যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ অন্য একটি দিক বুদ্ধদেব বসু আমাদের সামনে তুলে আনেন।

বইটির প্রথম অধ্যায়ের নাম 'বনবাসের শেষ দিন'। বুদ্ধদেব তাঁর সমগ্র বইটি জুড়ে যে-কথাগুলি বলার চেষ্টা করেছেন, তার পূর্বাভাস ও পূর্বরূপ এই প্রথম অধ্যায়েই পাই। লেখক প্রথমেই আমাদের নিয়ে যান সামান্য এক জলাশয়ের ধারে, যেখানে যুধিষ্ঠিরের দিগ্‌বিজয়ী অমিতশক্তিমান ভাইরা ভূলুণ্ঠিত। প্রত্যেকেই ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। ধর্মবকের একগুচ্ছ প্রশ্নের উত্তরদানের মাধ্যমে যুধিষ্ঠির ভাইদের হারানো প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। তাঁর অন্যান্য ভাইদের মতো যুধিষ্ঠির সফল যোদ্ধা নন, কিন্তু যুধিষ্ঠির যা পারেন, তা আর কেউ পারে না। এই তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তটিকে আলোচনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে প্রাবন্ধিক উপস্থাপন করেছেন। তিনি মহাভারতের ঘটনাপ্রবাহ অনেকখানি পেছনে ফেলে এসে, বনপর্বের এই ঘটনাটিকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চেয়েছেন। বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাভারতের ব্যাপকতার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়েছেন লেখক। অনুভব করিয়েছেন মহাভারতের দার্শনিক, নাটকীয়, অতিরঞ্জিত এবং প্রক্ষেপযুক্ত এই সুবিশাল কাহিনিকে। এবিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ভাবনিরপেক্ষ। মহাভারতকে তিনি নির্দিষ্ট কোনও গ্রন্থ হিসেবে দেখতে রাজি নন। মহাভারত তাঁর কাছে কেবল ধর্মগ্রন্থ বা পুরাণ নয়—এটি কাব্য, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, বিশ্বকোষ, সমকালীন ভারতের নানান ছবি সম্বলিত এক বিরাট গ্রন্থ।

''কিন্তু শুধু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে নয়, সমগ্র মহাভারতেও একটি ঐক্য আমরা খুঁজে পাবো, যদি তার বহিরাশ্রয় বিশ্লেষণ করি। বহিরাশ্রয়—মানে গল্পাংশ, যাকে বলে 'প্লট' অথবা মূল কাহিনী। প্রশ্ন উঠতে পারে, সেটি কী, কতটুকু, কোন-কোন অংশ নিয়ে তার সংগঠন, আমরা তার সীমারেখা টানবো কোথায়? এ-বিষয়ে আমার যা ধারণা তা আশা করি এই আলোচনাক্রমে প্রকাশ পাবে; এখানে শুধু দু-একটি কথা বলে রাখতে চাই। প্রথমত, তা নিছক যুদ্ধ-বৃত্তান্ত নয়—কোনোমতেই নয়; কোনো রুধিরাক্ত নিবেলুঙ্গেন-গাথার হিন্দু প্রকরণরূপে মহাভারতকে কল্পনা করা অসম্ভব। যদি কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষই মূল কাহিনী বলে নির্দিষ্ট হয়, তাহলে তো আদিপর্বের শেষার্ধ, সভাপর্ব, উদ্যোগপর্ব আর গীতা-বর্জিত ভীষ্মপর্ব থেকে সৌপ্তিক পর্যন্ত পাঁচটি পর্বকে সংক্ষেপিত করে নিলেই আমরা 'বিশুদ্ধ' মহাভারতটিকে হাতে পেয়ে যাই, অন্য সবই অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু এ-ভাবে সম্পাদিত হলে, নির্ভয়ে বলা যায়, এই ভারত-কথাটি ভারতবর্ষীয় জীবনযাত্রার বাইরে পড়ে থাকতো, গ্রন্থাগারে সুখনিদ্রায় মগ্ন, যা থেকে তাকে মাঝে-মাঝে টেনে তুলতেন শুধু শ্যামল অথবা অরুণবর্ণ পণ্ডিতেরা। অথবা যদি ভরতবংশের বিবরণ বলে ভাবি তাহলে প্রথমেই বন ও মৌষলপর্বকে ছেঁটে ফেলতে হয়—মহাভারতকে বর্বর হাতে মর্মাঘাত করে। আমাদের কাছে এ-কথা অতি স্পষ্ট যে মহাভারতের মূল কাহিনী তার প্রতিটি পর্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত—অচ্ছেদ্যভাবে, যুক্তিসিদ্ধভাবে—মরুপ্রতিম শান্তি ও অনুশাসনটিও সর্বতোভাবে এর ব্যতিক্রম নয়।''[১]

বুদ্ধদেব বসুর উক্তি থেকে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি যে, মহাভারতের মতো একটি মহাকাব্যের আক্ষরিক অর্থেই 'মহাভারত' হয়ে ওঠার পেছনে সমস্ত পর্বই সমান ভূমিকা পালন করেছে। তিনি স্পষ্টতই দেখাতে পেরেছেন, মহাভারতের মূল রস শান্ত রস। ক্ষমতার লড়াই ও যুদ্ধ মহাভারতের অন্যতম বিষয় হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এই যুদ্ধ ও ক্ষমতা দখলের রাজনীতির বৃত্তের বাইরেও মহাভারতের একটি বড় পরিসর আছে। এ নিয়ে দু-একটি কথা বলা যায়।

আমাদের জীবনবোধ, ধর্ম ও দর্শনচেতনা এবং ব্যক্তিজীবনের সংকট থেকে উত্তরণের উপায় প্রভৃতি মহাভারতের বনপর্ব, শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্বে পাওয়া যায়। ধর্মের স্বরূপ নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও সেই সম্পর্কিত নানা গল্প, রাজা কীভাবে সাম্রাজ্য চালাবেন বা শত্রুর আক্রমণ রোধ করবেন, কীভাবে দেশের করব্যবস্থা উন্নত করবেন, রাজার শত্রু ও মিত্র কারা হতে পারেন, আদর্শ রাজার গুণাবলি কেমন হবে, ন্যায় কী, এছাড়া বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি ও গল্পে এই পর্বগুলি পূর্ণ। এই পর্বগুলি ঈশ্বর, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্বের গভীর ভাষ্য বহন করে চলেছে। মহাভারতের মূল রস এই পর্বগুলিতেই নিহিত। নীতিকথা, গল্প, পুরাণকথার মধ্য দিয়ে এক আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা এগুলিতে উপস্থাপিত। লেখক যুক্তিনির্ভর এক আলোচনার মাধ্যমে মহাভারতের এই কম আলোকপ্রাপ্ত দিকটি সুন্দরভাবে উত্থাপন করেছেন। সবথেকে উল্লেখযোগ্য, এই তিন পর্বের গল্প ও পুরাণকথাগুলি ভারতের বর্তমান বিবিধ সমস্যার আয়ুধ হয়ে উঠতে পারে। একুশ শতকে আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির নিরিখে এগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এই বিষয়ে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়ার চেষ্টা করব। পাশাখেলায় পরাজিত সম্রাট যুধিষ্ঠির সমস্ত সম্পদ হারিয়ে, নিজ রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে নিঃস্ব বনবাসীর জীবন কাটাচ্ছেন। আগামী দিনগুলি নিয়ে উৎকণ্ঠা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যাবতীয় বিপর্যয়ের জন্য নিজেকে এবং ভাগ্যবিপর্যয়কে দায়ী করে চলেছেন। কীভাবে পরবর্তী বছরগুলিতে জীবন অতিবাহিত করবেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কোনওভাবেই তা বুঝে উঠতে পারছেন না। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে তিনি ঋষি-মুনিদের সান্নিধ্যে বারো বছর কাটিয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয়, লোমশ ঋষিদের কাছে অধীর আগ্রহে শুনেছেন প্রতিটি তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য ও জ্ঞানমূলক নানা বাণী। সাধারণ সন্ন্যাসীর মতো পায়ে হেঁটে আর্যাবর্ত, দাক্ষিণাত্য ও সিন্ধুপ্রদেশ ঘুরে এসেছেন। এই বছরগুলিতে অর্জুন ও ভীম যখন নানাভাবে শক্তিসঞ্চয় করেছেন, তখন যুধিষ্ঠির একাগ্রচিত্তে বাধ্য ছাত্রের মতো জ্ঞান অর্জন করে চলেছেন। অনেক সময় যুধিষ্ঠিরের এই অবস্থান আমাদের গভীরভাবে পীড়া দেয়, মেনে নিতে কষ্ট হয় যে এত বিপর্যয়ের পরেও কেউ এত নির্লিপ্ত হয় কীভাবে! কিন্তু লেখক যুক্তিসংগতভাবে দেখাতে পেরেছেন যে, এই বারো বছর যুধিষ্ঠির যা কিছু শিখবেন ও অনুধাবন করবেন সেইসব জ্ঞান পরবর্তী বছরগুলিতে রাজত্ব চালাবার কাজে সহায়ক হবে। দায়িত্ব, কর্তব্য, ধর্ম সম্পর্কে যুধিষ্ঠির বিশদে জ্ঞানলাভ করেই চলেছেন। শান্তি ও অনুশাসনপর্ব জুড়েও যুধিষ্ঠির শুধুই শিখছেন। লেখক খুবই সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে বনপর্বে ঋষিদের সান্নিধ্যে যুধিষ্ঠির জীবনযুদ্ধে বাঁচার রসদ পাচ্ছেন। জীবনের রণক্ষেত্রে পরাজিত, অপমানিত একজন মানুষ ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন।

লোমশ ও মার্কণ্ডেয় মুনির সান্নিধ্যে থাকার সময় যুধিষ্ঠিরের মনে এক গভীর প্রশ্নের উদয় হয়। তিনি জানতে চান কেবলমাত্র তিনিই কি জগতে সবচেয়ে বেশি দুঃখী! বলা বাহুল্য, লেখক দেখাতে পেরেছেন যে বনপর্ব মহাভারতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আত্মজিজ্ঞাসা এবং প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে; এবং এগুলির উত্তরও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দিয়েছে। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে লোমশ জানাচ্ছেন যে শুধু যুধিষ্ঠিরই নন, রাজা নলও অনেক বেশি বেদনা অনুভব করেছেন। এরপর লোমশ বর্ণনা করেন নল কীভাবে সমস্ত সম্পদ অর্জন করেছিলেন এবং পাশাখেলায় হেরে তাঁর কী করুণ অবস্থা হয়েছিল, কীভাবে নলের মতো যুধিষ্ঠিরও সমস্ত কিছু ফিরে পেতে পারেন। আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে যুধিষ্ঠির ক্রমশ মানসিকভাবে দৃঢ় হতে

পারছেন, এই মানসিক ক্ষমতা আগামী দিনে যুদ্ধের ময়দানে তাঁর পাথেয় হবে। এই পর্বেই আমরা দেখতে পাই দ্রৌপদীও ঋষিদের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছেন ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে। ঋষিরা দ্রৌপদীকে জানিয়েছেন, সাবিত্রীর হাহাকার-বেদনা দ্রুপদতনয়া অপেক্ষা অনেকাংশে তীব্র ছিল।

যখন বনপর্বে ''সেই রহস্যময় বকপক্ষীর সামনে যুধিষ্ঠিরকে আমরা দেখতে পাই, তখনই উপলব্ধি করি যে এই অরণ্য... ছিলো যুধিষ্ঠিরের কাছে এক... মহান বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে বারো বছর ধরে শিক্ষা পেয়েছেন তিনি—অস্ত্রবিদ্যায় নয়, পুঁথিগত শাস্ত্রেও নয়—আত্মবিকাশে, আত্মসন্ধানে, বিশ্বচেতনায়।''[২]

বইটির প্রথম চারটি অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে প্রারম্ভিক আলোচনার পর বুদ্ধদেব বসু আমাদের নিয়ে যান 'নায়কের সন্ধানে'। এরপর কার্যত পুরো বইটি জুড়েই তিনি আমাদের সামনে মহাভারতের নায়ক চরিত্রটিকে উপস্থাপন করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে লেখকের বক্তব্য :

''কিন্তু ঐক্যসাধনও অবলম্বননির্ভর, আর আমার কাছে এ-কথাও স্পষ্ট যে সেই অবলম্বন বা উপায় হিসেবে ব্যাসদেব একটি চরিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন—একটি চরিত্র, যাঁকে কেন্দ্র করে অন্য সব বিষয় দিগ্বিদিকে বিকীর্ণ হতে পারে—অর্থাৎ মহাভারতে আমি একজন নায়কের উপস্থিতি অনুভব করি। এবং সেই নায়ক বা কেন্দ্রিক চরিত্রটি—বহুযুদ্ধজয়ী... শ্রুতকীর্তি অর্জুন নন, সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন লোকোত্তর বাসুদেবও নন—তিনি এক ধীর মৃদু লজ্জাশীল অস্থিরমতি মানুষ : তিনি যুধিষ্ঠির।''[৩]

মহাভারতে বর্ণময়, রঙিন ও বহুমাত্রিক চরিত্রের অভাব একেবারেই নেই। সেখানে যুধিষ্ঠিরের মতো একটি বর্ণহীন ও প্রায় একমাত্রিক একটি চরিত্রকে নায়কের আসনে বসানো বেশ সমস্যাদায়ক বিষয়। লেখক সম্ভবত এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাই প্রাথমিকভাবে দু-একটি কথা তিনি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, মহাকাব্যের নায়কোচিত কোনও লক্ষণেই তেমনভাবে কখনও যুধিষ্ঠির ভূষিত হননি, কাহিনির মধ্যে তাঁর অগ্রসরণও অতি মন্থর, এমন এক চরিত্রকে আমরা কীভাবে নায়কের আসনে বসাতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর লেখক পুরো 'মহাভারতের কথা' জুড়ে খুঁজে দেখতে চেয়েছেন। যুধিষ্ঠিরকে নায়কের আসনে বসাতে গিয়ে তিনি দেশবিদেশের বিখ্যাত বেশ কিছু সাহিত্যগ্রন্থের দৃষ্টান্ত এনেছেন। উঠে এসেছে আকিলেউস-হেক্তোরের ইলিয়াড, দান্তের ইনফের্নো, গ্যেটে-র ফাউস্ট, অন্ধ রাজা অয়দিপৌস ও আগামেম্নন প্রসঙ্গ, এসেছে ভার্জিলের ঈনিয়াস-দিদোর কাহিনি। রামায়ণের রামের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের তুলনামূলক একাধিক আলোচনা নজর কাড়ে। এছাড়াও লিও তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস', রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এর আলোচনা নানা সময়ে উঠে এসেছে। এই বিপুল জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আমাদের ঋদ্ধ করে।

বুদ্ধদেব বসুর যুধিষ্ঠিরের পিতৃপরিচয় সম্পর্কিত বিশ্লেষণটি খুবই মূল্যবান। এ-বিষয়ে তিনি প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণ্যে'-র সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেছেন। বুদ্ধদেববাবু মনে করেন ধর্মাচরণই যুধিষ্ঠির ও বিদুরের মধ্যে সম্পর্কের মূল যোগসূত্র। প্রতিভা বসুর অভিমত, উভয়ের সম্পর্কের ভিত্তি ধর্মে নয়—সিংহাসন দখলের উদ্দেশ্যমূলক চক্রান্তে। বুদ্ধদেব মনে করেন, বিদুর-যুধিষ্ঠিরকে পিতাপুত্ররূপে মেনে নিলে মহাভারতের পরিচিত কাঠামোটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে; তাছাড়া যুধিষ্ঠির যদি মনুষ্যপুত্র হতেন, তাহলে সেটি মহাভারতের ক্ষেত্রে দূরপ্রসারী ইঙ্গিতপূর্ণ একটি ঘটনা হত। সূর্যপুত্র কর্ণের জন্মের মতো সেটিও খুব সহজেই প্রকাশিত হয়ে পড়ত।

তিনি যুধিষ্ঠির-বিদুরের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের মাত্রাটি স্বীকার করেননি, পরিবর্তে দেখিয়েছেন উভয়ের ধর্মবোধ, সাধুতা এবং সদাচার।

'আগুন-জলের গল্প' বুদ্ধদেব বসুর নিজের আবিষ্কার। যাঁরা মিথ নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁরা মিথ ভাবনার অন্তরাল থেকে আবিষ্কার করেন বাস্তব বা পরাবাস্তবের সত্যকে। সে-সত্য বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। লেখক খাণ্ডবদাহনকে নগরসভ্যতা বিকাশের ধারা হিসাবে পড়তে চান। খাণ্ডবদাহনের তাৎপর্য বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক আমাদের আগুন-জলের গভীরতর এক বিন্যাসের গল্প বলতে থাকেন। বিশ্বসাহিত্য থেকে উঠে আসে অ্যাকিলিউস-স্কামান্দ্রাসের সেই ইলিয়াড কাহিনি, যেখানে আগুন জয়লাভ করে, দেবতার রোষাগ্নিতে নদীস্রোত ধ্বংস হয়ে যায়। খাণ্ডবদাহনেও ইন্দ্রের পরাজয় ঘটে। জয়ী হয় অগ্নি, বৃষ্টির বিরুদ্ধে জয় হয় দাবানলের। এই পরস্পর বৈপরীত্যের মধ্যেও 'মহাভারতের কথা'র লেখক খুঁজে পান 'একটি মৌলিক মৈত্রী'।

বুদ্ধদেব বসু

জল-আগুনের সন্ধির ফলেই—বৃষ্টি-রৌদ্রের সমবায়েই সৃষ্টি ও সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়। শস্য ও ফল সঞ্জাত ও পরিপুষ্ট হয়, আগুন-জলের সংযোগে আমাদের অন্ন স্বাদু ও সুপাচ্য হয়ে ওঠে।[৪]

গুরুত্বপূর্ণ এই ভাবনার মধ্য দিয়েই খাণ্ডবদাহন শুধুমাত্র অগ্নি-বরুণের বিরোধের এক কাহিনি হয়েই থেকে যায় না, প্রকাশিত হয়ে ওঠে এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা আরও একাধিক অর্থ নিয়ে। প্রাবন্ধিক আমাদের মনে করিয়ে দেন মহাপ্রস্থানের পথে অর্জুনকেও গাণ্ডীব ও তূণ সাগরজলে নিক্ষেপ করতে হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু আরও দেখিয়েছেন যে কৃষ্ণের নগরীকে বরুণই শেষ পর্যন্ত গ্রাস করেন এবং বলরাম যোগবলে নিজের দেহ সমুদ্রে মিশিয়ে দেন। এভাবে আগুন-জলের গল্প একটি পূর্ণবৃত্ত রচনা করল। এর মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে ধরা দেয় যে প্রত্যেক সৃষ্টির ধ্বংস অনিবার্য। এভাবে আগুন-জলের আবিষ্কৃত প্রতিপাদ্যটি একটি সুন্দর উপস্থাপনা হয়ে ওঠে।

মহাকাব্যের নায়করূপে কোনও চরিত্রকে বেছে নেওয়ার পেছনে কিছু মানদণ্ড ও যুক্তি থাকাটাই স্বাভাবিক। এগুলির মধ্যে থাকতে পারে—ত্যাগ, বীরত্ব, মহৎ কার্যকলাপ, কাহিনির মধ্যে অগ্রসরণ, নায়কোচিত লক্ষণ ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসু যুধিষ্ঠিরকে নায়করূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে-মানদণ্ডটিকে নির্বাচন করেছিলেন, সেটি মূলত জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং ধর্মবোধ। মহাভারতের মতো একটি মহাকাব্যের বিশ্লেষণ বহুমাত্রিক হওয়াটাই কাম্য। শৌর্য, বীরত্ব, প্রতিভার মতো নায়কোচিত গুণগুলি মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের থেকে অন্যান্য অনেক চরিত্রেই নিশ্চিতরূপে বেশি পাওয়া যায়। এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ও ধর্মবোধে প্রতিষ্ঠিত যে-নায়কত্ব তাকে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসু

এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

তিনি রামচন্দ্র ও অর্জুনের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের এক তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্তব্যে অবিচল, প্রজানুরঞ্জনে যা উচিত মনে হয় সেটি দ্রুত করতে বদ্ধপরিকর। বংশ, কৌলীন্য, সম্মান—এগুলিকে শিরোধার্য করে রাম এগিয়ে যান। বাল্মীকির রামচন্দ্র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তন্নিষ্ঠভাবে তাঁর কুলধর্ম, রাজধর্ম, স্বধর্ম পালন করে এসেছেন। সাধারণ মানবিক বৃত্তির অনেক উপরেই মহামানব অবস্থান করেন—বুদ্ধদেববাবু দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে তিনি দেখিয়েছেন যে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে রামচন্দ্রের মতো চরমতা নেই, তিনি অনেকটা সাধারণ মানুষের মতো অনুভূতি-সম্পন্ন। শাস্ত্রজ্ঞান থাকলেও তিনি সংশয় ও মানসিক টানাপোড়েনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন। যুধিষ্ঠির বৈরাগ্যসাধক নন, ধর্মপুত্র হয়েও তিনি কাম ও অর্থকে অবজ্ঞা করেন না।

অর্জুনের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র যুধিষ্ঠিরকেই আমরা চিনি না, চিনে নিতে থাকি 'বিশ্বপ্রকৃতির আদুরে ছেলে' অর্জুনকেও। সারাজীবন ধরে অর্জিত খ্যাতির পরিমাণ নিতান্তই কম নয় অর্জুনের, তাঁর মতো ভ্রমণ অভিজ্ঞতাও আর কারও নেই। লেখক দেখিয়েছেন উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণের পরিধি। অর্জুন অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন নাগলোক থেকে ইন্দ্রের স্বর্গপুরী পর্যন্ত, মানবজীবনের কাম্য যেসব বিষয় আছে তার প্রায় সবকিছুই অর্জুন লাভ করেছেন, তবু 'পরিণতিহীন চিরপ্রফুল্ল বালক'ই জীবনভর রয়ে গেলেন তিনি। অথচ যুধিষ্ঠিরের জীবন অর্জুনের সম্পূর্ণ বিপরীত। জীবন যত এগিয়েছে ততই চলার পথে বাধা পায়ে জড়িয়ে থেকেছে, প্রতি পদক্ষেপেই অনিশ্চয়তা গ্রাস করেছে জীবন, নিজের প্রতি ও অন্যান্যদের প্রতি দায়িত্বে সংকট এসেছে। এই সংকট ও টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই ন্যায়, ধর্ম, জীবনের অর্থ প্রভৃতি জটিল দার্শনিক ভাবনাগুলি যুধিষ্ঠিরের বোধগম্য হয়েছিল। বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন এই জ্ঞান, বোধ এবং প্রজ্ঞাই যুধিষ্ঠিরকে 'নায়ক' চরিত্রে নিয়ে গেছে।

মহাভারতের কাহিনি এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের পরিবর্তনগুলি প্রাবন্ধিক অত্যন্ত দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। পাশাখেলায় মত্ত যুধিষ্ঠিরকে যেমন অরণ্যের 'এক বিশ্ববিদ্যালয়'-এর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মেলানো যায় না, তেমনই যুদ্ধের আগের ও পরের যুধিষ্ঠির আলাদা। যুদ্ধে হয়তো বেশি শত্রু তিনি নিধন করতে পারেননি, কিন্তু রণভূমিতে তাঁর উৎসাহ এবং শত্রুনিপাতন সংবাদে উল্লাস চোখে পড়ার মতো। এই যোদ্ধা যুধিষ্ঠিরের চেহারাটা আমাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত।

যুদ্ধে শল্যবধের কাহিনি সঞ্জয়ের মুখে শুনে ধৃতরাষ্ট্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছেন। তিনি কিছুতেই তাঁর পরিচিত যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে এই যুধিষ্ঠিরকে মেলাতে পারছেন না। লেখক যুধিষ্ঠির চরিত্রের এই পরিবর্তন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাঁর 'সংক্রান্তি' নাটকেও ধৃতরাষ্ট্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছে :

''কিন্তু যুধিষ্ঠির—
অসূয়াহীন, মৃদুভাষী, নির্লোভ,
আমরা যাঁর কথা মান্য করলে
যুদ্ধ কখনো হতো না—
তিনি চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট,
নিজেই নিজের বিরুদ্ধাচারী—
সঞ্জয়, এও কি সম্ভব হলো আজ?''

যুধিষ্ঠিরের এই চারিত্রিক পরিবর্তনের বিষয়টিকে লেখক যথোচিত ও সুসংগত বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যান্য সমস্ত ঘটনার মতো এই পরিবর্তনও যুধিষ্ঠিরের জীবনে প্রয়োজন ছিল।

বুদ্ধদেববাবু আমাদের দেখিয়েছেন ধর্ম শব্দটির বহুমাত্রিক ও গভীর অর্থ। কালের নিয়মে এবং পরিবর্তনশীল সমাজে ধর্মের অর্থ অভিন্ন হতে পারে না, ধর্ম শেষ পর্যন্ত একটি আপেক্ষিক বিষয়। 'ধর্ম-অধর্ম-স্বধর্ম' অধ্যায়ে প্রাবন্ধিক এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারায় এ-বিশ্লেষণ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবে।

রাজা হলেন যুধিষ্ঠির। লেখক আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, রাজসূয় যজ্ঞ করে 'রাজচক্রবর্তী' সম্রাট হয়েছিলেন যুধিষ্ঠির, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা তিনি সমগ্র আর্যাবর্তের রাজা হিসাবে স্বীকৃতি পান। খুব সুন্দরভাবে যুধিষ্ঠিরের রাজার ভূমিকাটিকে সমালোচনা করেছেন লেখক। দক্ষ রাজা হিসেবে যুধিষ্ঠির পুরোপুরি কৃতকার্য নন, কিন্তু তিনি নারদ সহ অন্যান্য জ্ঞানী ঋষিদের সান্নিধ্যে থেকে রাজনীতির জটিল তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করছেন। অনুশাসনপর্ব এবং শান্তিপর্বের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে এই সমস্ত গম্ভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়। বুদ্ধদেব বসু বলতে চান, এই জ্ঞান ও তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করার মাধ্যমেই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব হয়ে উঠেছেন মহাভারতের 'নায়ক'। এই মহামূল্যবান জ্ঞান, বোধ এবং প্রজ্ঞাই যুধিষ্ঠিরকে অন্যান্যদের থেকে উচ্চতর স্থান দিয়েছে। লেখক শেষ দুটি অধ্যায়ে অর্জুনের সঙ্গে চমৎকার একটি তুলনার মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে মহাভারতের কাহিনি অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের ভূমিকা ও গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। মহাপরাক্রমশালী, সমস্ত অস্ত্রে পারদর্শী যে-সব্যসাচী অর্জুনকে পাঠক দেখতে অভ্যস্ত, তাঁকে শেষ পর্বে একেবারেই অসহায় এবং সর্বস্বহারা এক সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা দেখতে পাই। মহাদেব, দেবরাজ ইন্দ্র এবং গুরু দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে অর্জিত অস্ত্রের ব্যবহার অর্জুন ভুলে যান, সমস্ত যুদ্ধে জয়ী অর্জুনের পরাজয় ঘটে সামান্য দস্যুদের কাছে, যাদব নারীদের সুরক্ষায় একেবারে ব্যর্থ হন অর্জুন। এসবের পরেও জীবন থেকে কোনও শিক্ষা কি তিনি নিতে পেরেছেন? মনে পড়ে 'কালসন্ধ্যা' নাটকে ব্যাসদেবের উচ্চারণ :

> ''তুমি, পার্থ, কখনো হবে না প্রাজ্ঞ। তবু শেখো
> অন্তত বিনয়, দৈন্য, আত্মসমর্পণ।... শেখো :
> অসামান্য প্রতিভাও দণ্ডনীয়,
> বিনামূল্যে লভ্য কিছু নেই,
> সব দান ছদ্মবেশী ঋণ।''

মহাপ্রস্থানের পূর্বেও : ''যুধিষ্ঠির এমন-কিছু অর্জন করলেন যা পূর্বে তাঁর অধিকারভুক্ত ছিলো না, আর অর্জুন হারাতে- হারাতে চললেন যা-কিছু তাঁর জীবন-জোড়া সম্পদ ছিলো।''[৫]

মহাভারতের শেষ মুহূর্তে সামান্য একটি কুকুরের জন্য স্বর্গসুখ বর্জনে বদ্ধপরিকর ছিলেন যুধিষ্ঠির, সমস্ত পার্থিব মোহ এবং লোভ যথার্থই তিনি পৃথিবীতে ফেলে রেখে যেতে পেরেছিলেন। সমগ্র মহাভারত জুড়ে ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকা যুধিষ্ঠিরকে এখানে আমরা পাই 'এক বিশ্ববিদ্যালয়ে'র সময়পর্বের যুধিষ্ঠিররূপে। সেই যুধিষ্ঠির যিনি ধর্মবকের 'সুখী কে'—এই প্রশ্নের উত্তরে দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছিলেন, অঋণী অপ্রবাসী স্বগৃহে শাকান্নভোজী একটি মানুষের কথা। শান্তিপর্বে এই যুধিষ্ঠির অর্জুনকে আবার মনে করিয়ে দেন—''আমি অর্জন করবো গ্রাম্য সুখ, বর্জন করবো প্রিয়-অপ্রিয় ভেদজ্ঞান, সহ্য করবো শীত উত্তাপ ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রম, স্থাবর-জঙ্গম কোনো সত্তাকে হিংসা করবো না কখনো, কোনো কার্যেই লিপ্ত হবো না, স্পৃষ্ট হবো না শোকে অথবা হর্ষে, আমি মুণ্ডিতমুণ্ড মুনি হয়ে অরণ্যপথে একাকী প্রাণত্যাগ করবো। শুধু সে-ই সুখী, অর্জুন, জন্ম মৃত্যু ব্যাধি বেদনায় পরিকীর্ণ এই সংসার যে পরিত্যাগ করতে পারে।''[৬]

'মহাভারতের কথা' পড়তে গিয়ে আমরা বাস্তবিকই যুধিষ্ঠিরকে নতুন চোখে আবিষ্কার করি। আসলে বুদ্ধদেব বসু তাঁর নায়ককে বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেই মহাভারত পড়তে চেয়েছেন। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরকে এভাবেই তলিয়ে ভাবার প্রয়োজন ছিল, কারণ পরবর্তী কালে ধর্ম ও ন্যায় নিয়ে যখন বিস্তারিতভাবে বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এবং নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মহাভারত সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি পড়ি তখনই যুধিষ্ঠিরের বৃহত্তর চেতনার পরিপেক্ষিতে ধর্ম, ন্যায় ও দণ্ডনীতির মতো বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। বলা বাহুল্য, মহাভারত গভীরভাবে হৃদয় ও মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারলে তবেই ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবনে পরিপূর্ণতা লাভ হয়। এইদিক থেকে ভাবলে বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত চর্চা অন্য মাত্রা পায়। তাই পরিশেষে দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা বলতেই পারি যে বিশ শতকে বিখ্যাত অন্যান্য বাঙালি মহাভারত সমালোচকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত সম্পর্কিত জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রটি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র

১। বুদ্ধদেব বসু, *মহাভারতের কথা*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০৪, অধ্যায় : মূল কাহিনী, পৃঃ ৩৯-৪০

২। তদেব, অধ্যায় : এক বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৫৩

৩। তদেব, অধ্যায় : মূল কাহিনী, পৃঃ ৪০

৪। দ্রঃ তদেব, অধ্যায় : আগুন-জলের গল্প, পৃঃ ৮৯

৫। তদেব, অধ্যায় : ঐশ্বর্যের দারিদ্র্য : দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য

৬। সুদক্ষিণা ঘোষ, *মহাভারতের কথা : যে জাগায় চোখে নূতন-দেখার দেখা*, কোরক, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ১৯৪

লেখকের প্রতি

* নিবোধত পত্রিকার জন্য যে-লেখাটি পাঠাতে চলেছেন তার একটি নকল নিজের কাছে রাখুন। **আমরা কোনও পাণ্ডুলিপি (মনোনীত বা অমনোনীত) ফেরত দিই না।**
* আপনার নাম, সম্পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল নম্বরের উল্লেখ অবশ্যই করুন।
* আগে কোথাও ছাপা হয়েছে এমন লেখা পাঠাবেন না।
* শুধু ধর্মীয় প্রসঙ্গ নয়—দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, বরেণ্য সাধক ও মহাপুরুষদের কথা নিয়ে ইতিবাচক লেখা আমরা প্রকাশ করি।
* আপনার প্রবন্ধ ১৫০০ থেকে ৩০০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* ধারাবাহিক রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠাতে হবে।
* সমালোচনার জন্য বই পাঠালে দুটি পাঠাতে হবে।
* **লেখা পাঠাবেন ই-মেলে (nibodhatapatrika@gmail.com), pdf করে।**
* প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতির তথ্যসূত্র অবশ্যই দিতে হবে। উল্লেখ করুন : লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশনা সংস্থার নাম, প্রকাশের স্থান ও বর্ষ, খণ্ড (যদি থাকে) এবং পৃষ্ঠা।